শতাব্দীর মোহনায় সিডনি

প্রদীপ দেব

০৫

বছরের শেষ দিন আজ। অনেকেই বলছেন শতাব্দীর শেষ দিন। স্বপনদার সাথে এব্যাপারে আলাপ হচ্ছিলো সকাল বেলা। আজ বছরের শেষ দিন নাকি বিংশ শতাব্দীর শেষ দিন? যেটুকু হিসাব আমরা জানি, যেমন প্রথম শতাব্দী হলো এক সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় শতাব্দী হলো ১০১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ২০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম মিলেনিয়াম বা প্রথম হাজার বছরের ব্যাপ্তি হলো এক সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সে হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শেষদিন আর দ্বিতীয় হাজার বছরের শেষদিন হবে ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর। তার মানে আরো একবছর পর। কিন্তু মানুষের অপেক্ষা সইছেনা। তাই আজকেই নতুন মিলেনিয়ামকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি হয়ে আছে সবাই। সারা পৃথিবী ব্যাপী ব্যাপক আয়োজন চলছে এই ২০০০ সালকে আবাহন করার জন্য। অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে কম্পিউটারের জগতে একটা বিরাট ধরনের ধাক্কা লাগতে পারে ২০০০ সাল শুরু হবার সাথে সাথে। এর নাম দেয়া হয়েছে ওয়াই টু কে বাগ, বা মিলেনিয়াম বাগ। ওয়াই টু কে মানে দুই কিলো বছর। মানে দুই হাজার সাল। সিডনি ২০০০ সাল নিয়ে অনেক বেশি মাতামাতি করছে, কারণ এই ২০০০ সালেই সিডনি অলিম্পিক, আর সিডনির পোস্টকোডও ২০০০। এদুটোর পারস্পরিক সম্পর্ক কিছু না থাকলেও এখানকার মানুষ বাঙালিদের চেয়েও হুজুগে। ওয়াই টু কে বাগ সামলানোর জন্য নানারকম কম্পিউটার সফ্টওয়ার বেরিয়ে গেছে। ব্যাংক থেকে অনেকে তাদের জমানো টাকা পয়সা তুলে নিয়ে নাকি বাড়িতে এনে রেখেছে। কারণ কেউ কেউ বলছে ব্যাংকের কম্পিউটারগুলো ২০০০ সালের শুরুতেই গন্ডগোল শুরু করে দেবে। সে যাই হোক। কম্পিউটার সম্পর্কে যাদের কিছুটা হলেও ধারণা আছে তারা জানে এরকম কোন ঝড় বয়ে যাবার সম্ভাবনা শুধুমাত্র একটা নতুন বছর শুরু হবার কারণে নেই। তারিখ লেখার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুই ডিজিট ব্যবহার করা হলে সেখানে ৯৯ এর স্থানে হঠাৎ ০০ হয়ে গেলে কম্পিউটার পাগলামী শুরু করে দেবে এরকম ভাবার খুব জোরালো কারণ নেই। তারপরও সবরকমের সাবধানতা নেয়া হয়েছে। সাবধানতার জন্য আলাদা করে কোথায় কী করা হয়েছে আমার জানা নেই। আমার ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টের লোকজনের মধ্যে এটা নিয়ে উত্তেজনা দেখিনি কখনো।

সিডনির বাঙালি কমিউনিটি নিউইয়ার্স ইভ পালন করে বেশ ধুমধাম করে। সেখানে যাবার সময় অনেকেই খাবার দাবার বানিয়ে নিয়ে যায়। স্বপনদা আর নীলিমাবৌদিও যাবেন যেখানে আজ। তবে অনেক রাতে। আগে আমাকে নিয়ে সিটিতে হারবার ব্রিজের ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখতে যাবেন। পরে ফিরে এসে সময় আর শক্তি থাকলে যাবেন বাংলাদেশের পার্টিতে।

নীলিমাবৌদি মাছের চপ বানাচ্ছেন পার্টির জন্য। স্বপনদা দোকান থেকে জিনিসপত্র এনে দিয়ে টেলিফোন নিয়ে বসেছেন। খবর নিচ্ছেন এক এক করে অনেকের। বুঝতে পারছি বাংলাদেশ থেকে যারা নতুন এসেছেন পড়তে বা ইমিগ্র্যান্ট হয়ে, তাদের মধ্যে যারা স্বপনদাকে চেনেন তাদের সবার খবর স্বপনদা রাখেন। টেলিফোনের এপ্রান্তে স্বপনদার কথার কয়েকটা টুকরো শুনেই বুঝতে পারছিলাম স্বপনদা আন্তরিক ভাবেই তাদের সাথে থাকেন তাদের সুখে দুঃখে। নীলিমাবৌদি রান্নাঘর থেকেই কিছু কিছু বিষয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন স্বপনদাকে। নীলিমাবৌদিও খবর রাখেন সবার। স্বপনদার সত্যিকারের সহধর্মীনি তিনি।

বাদলদার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। হাসপাতালে দেখতে গেলাম তাঁকে স্বপনদা আর নীলিমা বৌদির সাথে। এদেশের হাসপাতালগুলোতে আগে ঢুকিনি কখনো। এটা এই সাবার্বের হাসপাতাল। বেশ বড় আর ঝকঝকে পরিষ্কার। রোগী দেখার তেমন কড়াকড়ি নিয়ম নেই। এদেশের মানুষ ভীষণ ব্যস্ত। হাসপাতালে এসে অহেতুক ভীড় করার মত সময় কারো নেই, আর তত বেশি মানুষও নেই এদেশে। সে কারণেই হয়তো যে কেউ যে কোন রোগীকে দেখতে যেতে পারে। আমাদের কেউ কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না। রোগীর বিছানার কাছে চলে যাওয়া যায়। এখানে আরো একজোড়া ডক্টরেট দম্পতির সাথে দেখা হয়ে গেলো। বাদলদারা এখনো সন্তানের নাম ঠিক করেননি। এজন্য একটু উশখুস করছিলেন। কারণ সন্তান হবার সাথে সাথেই বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য নাম লাগে। নামটা তাই আগেভাগে ঠিক করে রাখে সবাই। কিন্তু আমরা তো বাঙালি। আমাদের নামকরণ এভাবে হাসপাতালে হয়না। আমাদের ঠিকমতো বার্থ সার্টিফিকেটেরই ব্যবস্থা নেই এখনো। তবে মনে হলো ছেলে অথবা মেয়ের জন্য একটা করে দুটো নাম ঠিক করে রাখাটা খুব বেশি কঠিন কাজ নয়। যে আসবে সে তো নোটিস ছাড়া হঠাৎ চলে আসে না। তারজন্য সবরকমের প্রস্তুতির সাথে একটা নাম ঠিক করে রাখাটাও আমাদের সংস্কৃতিতে ঢুকে যাওয়া উচিত।

দুপুরের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সিডনির উদ্দেশ্যে। টিভিতে সকাল থেকেই লাইভ দেখাচ্ছে হারবার ব্রিজের আয়োজন। দেখে মনে হচ্ছে লোকজন কাল রাত থেকে সেখানে জড়ো হতে শুরু করেছে। অনেকে দেখলাম স্লিপিংব্যাগ পেতে ঘুমাচ্ছে হারবার ব্রীজের কাছের চত্বরে। জায়গা পাবো কিনা এরকম একটা ভাবনা ক্ষণে ক্ষণে উঁকি মারছে। কিন্তু খুব একটা পাত্তা দিলাম না তাকে।

সিডনি যাবার পথে একটা সূর্যমন্দির আছে। বেশ সুন্দর। শ্রীলংকান কমিউনিটির মন্দির। মন্দিরের গায়ে নানারকম দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে। এই মূর্তিগুলি ঠিক পরিচিত নয় আমার কাছে। তবে সবার চেহারা মানুষের মতো। শ্রীলংকায় একসময় রাক্ষসরা থাকতো, রামায়ণ আমাদের এরকমই একটা ধারণা দেয়। মন্দিরে গিয়ে দেবতা দেখা আর মানুষ দেখা দুটোই সমান উপভোগ্য আমার কাছে। মন্দিরকে মাঝে মাঝে ক্যাসিনোর মতো মনে হয় আমার। এখানে মানুষ আসে ভক্তি দিয়ে জুয়া খেলতে। কেউ বিনিময়ে কিছু পায় আর বেশির ভাগ মানুষই কিছু পায়না। তবে পাবার লোভ থাকে সবারই। যারা প্রার্থনা করে ইহজগতের নানা প্রাপ্তির আবেদনই থাকে তাদের প্রার্থনায়। পুণ্যলোভী প্রবাসী মানুষগুলোকে দেখে কেমন একটা মায়া লাগে। মনে হয় তারা কত অসুখী। সুখী মানুষ নাকি বেগার খাটেনা,

প্রার্থনাও তারা করেনা। এরকম একটা কথা পড়েছিলাম কোথাও। সম্ভবত 'ডক্টর জিভাগো'তে।

এবার বেশ বেগে গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম সিডনি সিটিতে। সিডনি ইউনিভার্সিটি অব টেক্‌নোলজির কাছে একটা পার্কিং পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন স্বপনদা। সিটির আরো ভেতরের দিকে ঢুকলে রাতে আর গাড়ি বের করা যাবেনা। কারণ কয়েক লক্ষ মানুষ সিটি থেকে বেরুবে তখন একসংগে। গাড়ি থেকে আমাদের শুকনো খাবার আর পানীয়ের ক্যান ব্যাকপ্যাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম সিটির দিকে। কয়েকটা রাস্তা আমার কাছে পরিচিত মনে হলো। আকাশ জুড়ে রোদের মেলা। রাস্তায় গাড়ি চলাচলের ভীড় খুব একটা নেই, তবে জনস্রোত বাড়ছে। সবার হাতে নানারকমের বাঁশি। এখুনি তা বাজাতে বাজাতে চলেছে। মনে হচ্ছে মেলায় চলেছে সবাই। প্রায় প্রত্যেকের হাতে পানীয়ের ক্যান। কাঁধে বীয়ারের বড় বড় প্যাকেট নিয়ে চলেছে অনেকে। পাবলিক প্লেসে এলকোহল পান করা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে এই দেশে। কিন্তু আজ নিউ ইয়ার্স ইভের জন্য সে নিয়মের কড়াকড়ি শিথিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ভিক্টোরিয়া বিল্‌ডিং এর কাছে। আঠারো শতকের এই ভবন চেয়ে চেয়ে দেখার মতো সুন্দর। সাম্প্রতিক এক জরিপে এই বিল্‌ডিংটাকেই সবচেয়ে প্রিয় বিল্‌ডিং হিসেবে ভোট দিয়েছেন সিডনিবাসী। বিশাল ক্রিসমাস ট্রি সাজানো রয়েছে, হাজার রকমের রঙিন আলোর বাল্‌ব ঝুলছে তার পাতায় পাতায়। পুরো ভবন জুড়েই নানারকম দোকান। দোতলায় কফিশপে এক পেয়ালা কফির দাম ছয় ডলার, আর নীচের তলায় তার দাম মাত্র এক ডলার। এরকম পার্থক্যে কেমন ধন্দ লেগে যায়। এদেশে নাকি মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই সেভাবে। যে কোন জিনিসের যে কোন দাম হাঁকা যায়। তবে কীভাবে চলছে এই দেশ? আসলে এপ্রশ্নটা বড় বেশি অর্থনৈতিক, যার সম্পর্কে নীলিমাবৌদি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে বুঝতে পারলাম যে এবিষয়ে আমি কিছুই বুঝিনা। কফি খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। পিট স্ট্রিট মলে ঢুকে ঠিকই বুঝতে পারলাম কেন পিট স্ট্রিট মলকে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত বিপনীকেন্দ্র বলা হয়। পরিসংখ্যান বলছে সপ্তাহে গড়ে প্রায় দশ লাখ মানুষ এখানে কেনাকাটা করে। পিট স্ট্রিট মলের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বেরুলাম সিডনি টাওয়ারের কাছে। এই টাওয়ার সিডনির সেন্টারপয়েন্ট নামে পরিচিত। ৩০৫ মিটার উঁচু এই টাওয়ারে উঠে সিডনি সিটিকে দেখা যায় চারদিক থেকেই। ভেতরে ঢোকার সময় নেই বলে ঢুকলাম না কেউই। হাঁটতে হাঁটতে দেখা আর দেখতে দেখতে হাঁটা।

মানুষের ঢল নেমেছে সিডনি শহরে। গাড়ি চলাচল আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় শহরে গাড়ি ঢোকার পথ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে আস্তে আস্তে। হারবার ব্রিজের কাছে পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম। এর মধ্যেই লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে পুরো হারবার এলাকা। মানুষ বসে আছে দল বেঁধে। যে যেখানে বসেছে সেখান থেকে নড়ছে না, যদি জায়গা চলে যায়! স্বপনদার নেতৃত্বে একজায়গায় বসে পড়লাম। আসার সময় একটা বড় পলিথিন নিয়ে এসেছিলাম আমরা বসার জন্য। সেটা বিছিয়ে জায়গা দখল করলাম। আশে পাশে হাজার হাজার মানুষ। সব মুখই পরিচিত মনে হচ্ছে, আবার কাউকেই চিনিনা। জায়গাটি মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। এখান থেকে হারবার ব্রীজের ওপরের দিকের কিছু অংশ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভালো কোন জায়গা পাবার চেষ্টা করা উচিত। এখন

বাজে মাত্র পাঁচটা। আরো সাত ঘন্টার বেশি সময় কাটাতে হবে এখানে। স্বপনদাকে বসিয়ে রেখে নীলিমাবৌদি আর আমি হাঁটতে বেরুলাম। যদি আর কোন ভালো জায়গা পাওয়া যায়। ভীড় ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে ব্রীজের কাছাকাছি এসে দেখলাম এদিকে অনেক জায়গা এখনো খালি। পানির কাছাকাছি। এখান থেকে ব্রীজ পরিষ্কার দেখা যায়। আর সামনেই পানির মধ্যে যেন জেগে উঠেছে পৃথিবী বিখ্যাত সিডনি অপেরা হাউজ। আমার মনে হচ্ছে এখানেই বসে থাকি। কিন্তু স্বপনদাকে আনতে হবে এখানে। ডাকতে গেলে স্বপনদা বললেন ঐ জায়গা থেকে কিছুই দেখা যাবে না বলেই তা এখনো খালি রয়েছে। এত মানুষ যারা আগে এসেছে তারা কি বোকা নাকি যে জায়গাটা খালি রেখে দেবে? অকাট্য যুক্তি। কিন্তু যুক্তির বাইরে ইন্‌টুইশান বলে একটা কথা আছে। সেটার জন্যই খচখচ করছিলো মনের ভেতর। তবুও একবার সরে এসে আর একটু কাছে এসে বসলাম সবাই মিলে। ঠিক কোনদিক থেকে ফায়ার ওয়ার্ক্স হবে তা স্বপনদা বা নীলিমাবৌদি কারো ধারণা নেই। কারণ তাঁরাও আমার মতো এবছরই প্রথমবারের মত এসেছেন। যেখানে বসেছি সেখান থেকে অপেরা হাউজ দেখা যায়না। হেঁটে হেঁটে অপেরা হাউজের দিকে যাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ভীড় ঠেলে এক পাও সামনে যাবার উপায় নেই। কিছুক্ষণ পর পর একজন একজন করে বাইরে থেকে ঘুরে আসছি। সারি সারি অস্থায়ী টয়লেট বসানো হয়েছে। কয়েক লক্ষ মানুষের জন্য অপ্রতুল হলেও তেমন কোন অসুবিধা নেই। সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতা সেবকরা কাজ করে যাচ্ছেন। আর দেখলাম পুলিসিং। সিডনির পুলিশ গিজগিজ করছে সবখানে। সবাই খুব এলার্ট। মানুষের নিরাপত্তা এদেশে সবচেয়ে জরুরী। অনেক অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র চোখে পড়লো। অস্থায়ী হ্যালিপ্যাড চোখে পড়লো, যেখানে ছোট্ট একটা বায়ুযান অপেক্ষা করছে যদি কোন দরকারে লাগে। হারবার ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রেনও। বাংলাদেশের মানুষ এসেছেন অনেক। বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এসেছেন তাঁরা। বেশ উৎসব উৎসব ভাব চারদিকে। জায়গা ছেড়ে বেশি দূরে যাওয়াটাও বিপদ। হারিয়ে গেলে আমার পক্ষে কোথাও অপেক্ষা করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু আমার জন্য স্বপনদাদের সমস্ত আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। তাই জায়গায় ফিরে এলাম। এবার স্বপনদা আর নীলিমাবৌদি বেরুলেন একটু ঘুরে আসার জন্য।

জায়গা রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমার একার পক্ষে। আমাদের পাতা আসনেই বসে পড়েছে একজন অস্ট্রেলিয়ান তরুণী। একটু পরে হয়তো তার বয়ফ্রেন্ডও এসে বসে যাবে। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে তার একটু পরেই। আমি শুয়ে পড়লাম যতটা সম্ভব নিজেকে প্রসারিত করে। জায়গা আমাকে রাখতেই হবে। স্বপনদারা ফিরে আসার পরে টেনশান কমলো। কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখা। কতক্ষণ বাকী আছে এবছরের! এবার গল্প করার সময় পাওয়া গেলো।

স্বপনদা সিডনি সম্পর্কে জানেন অনেক কিছু। এখানে আসার সময় যে পিট স্ট্রিট আমরা পার হয়ে এসেছি সেই পিট সাহেব ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। সেই ১৭৮০ সালের কথা এসব। তখনো স্বাধীন অস্ট্রেলিয়ার জন্ম হয়নি। ইংল্যান্ড তখন নানারকম সমস্যায় পড়েছে। আমেরিকার সাথে যুদ্ধে হেরে গেছে। আমেরিকা স্বাধীন হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ায় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছে। দাসপ্রথা বিরোধী বিক্ষোভ চারদিকে। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ঋণে

জর্জরিত। নানারকম অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে মানুষ। জেলখানা ভরে যাচ্ছে। জেলখানায় জায়গা করার জন্য প্রায় ১৬০ ধরনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান দিয়ে আইন পাস করা হয়েছে। প্রতিদিন শত শত লোককে ফাঁসি দিয়েও জেলখানায় জায়গা করা যাচ্ছেনা। এই ক্রিমিনালদের কোথাও দ্বীপান্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করার ভার পড়লো লর্ড সিডনির উপর। ১৭৮৬ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় এসে যে জায়গা ঠিক করেন তার নাম দেন নিউ সাউথ ওয়েল্স। এই সিডনি শহরের নাম হয়েছে লর্ড সিডনির নাম অনুসারে। সিডনি নিউ সাউথ ওয়েল্স স্টেটের রাজধানী। ১৭৮৮ সাল থেকেই এখানে কয়েদীদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। তারা এখানে এসে আদিবাসীদের মেরে কেটে কীভাবে শেষ করতে চেয়েছে তা আরেক ইতিহাস।

রাত ন'টা বাজার সাথে সাথে প্রচন্ড শব্দে ফুটতে শুরু করলো শত শত আগুনের ফুল। আকাশে পাখা মেলে উড়তে না উড়তেই মিলিয়ে গেলো তা। মিনিট পাঁচেকের বেশি স্থায়ী হলো না এই বাজী পোড়ানো। এইই যদি আয়োজন হয় তাহলে মনে হচ্ছে বৃথাই গেলো লক্ষ মানুষের এই সমাবেশ। কিন্তু মানুষকে নড়তে দেখা গেলোনা একটুও। নয়টার বাজী পুড়িয়ে আসলে বিদায় জানানো হলো ১৯৯৯ সালের শেষ দিনের সূর্যকে। বিদায়ের বাজনাকে কেউ মনে রাখতে চায় না বলেই তা সংক্ষিপ্ত। এবার আবাহনের পালা। আমাদের কাছ থেকে দশ পনেরো হাতের মধ্যেই সাগরের পানি। সেখানে ভাসছে নানারকম সাজে সাজানো ছোট ছোট নৌকা। কী অপরূপ আলোয় সেজেছে সেগুলো। কোনটা হাঁসের মতো, কোনটা আবার ডলফিনের মতো সাজ নিয়েছে। সময় কেটে যাচ্ছে তার নিজস্ব নিয়মে। মানুষের ঘনত্ব বাড়ছে বেশ দ্রুত। এখন আর বসে থাকার উপায় নেই। আমাদের সামনের সারির সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। আমরাও উঠে দাঁড়িয়েছি। পাশের মানুষের সাথে এখন আর পার্সোনাল স্পেস রাখা সম্ভব হচ্ছে না কারো।

হঠাৎ যেন সবকিছু থেমে গেছে। নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শোনা যাচ্ছে না আর। ১৯৯৯ সালের শেষ মিনিট। হঠাৎ প্রচন্ড গর্জনে কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেলো। প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ একসাথে গুণতে শুরু করেছে টেন, নাইন, এইট, , , , ত্রি, টু, ওয়ান্‌ন্‌ন্‌, জিরো আর শোনা গেলো না। প্রচন্ড শব্দের সাথে আকাশ ভরে গেলো আগুনের ফুলে। হারবার ব্রীজের ওপর থেক নিচে, নিচ থেকে ওপরে, অপেরা হাউজের ওপর থেকে হাজার হাজার আগুনের ফুল ফুটতে লাগলো। শ্যাম্পেনের বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম মুহূর্তেই। মানুষ চিৎকার করছে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার। আলিঙ্গান করছে পরস্পর। চুমু খাচ্ছে প্রমিক প্রেমিকা। এমন মিলন মুহূর্ত আর হয়না। মোবাইল ফোনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে যারা কাছে নেই তাদের। এক একটা বাজী আকাশে উঠে হাজার খন্ডে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই খন্ডগুলি আবার ফুটছে শব্দে আর বর্ণে। হারবার ব্রিজে আগুন দিয়ে লেখা হয়ে গেলো 'ইটারনিটি'। চারদিকে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। পরিচিত অপরিচিত সবাই সবাইকে বলছে নতুন বছরটা শুভ হোক। সবার মুখে হাসি। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে নতুন বছর সবার আগে এসেছে নিউজিলান্ডে। তারপর এসেছে অস্ট্রেলিয়ায়। দুই মিলিয়ন মানুষ এসে সমবেত হয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে এখানে। প্রায় একমিলিয়ন নারী এসেছে এখানে। কোথাও কোন বাধা নেই, জড়তা নেই, ভীরুতা নেই। হিংসা নেই, বৈষম্য নেই। মনে হচ্ছে সব মানুষের ভেতরের সব মানবিক

গুণাবলীই এখানে বিকশিত আজ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই এখানে সামান্য হলেও এলকোহল খেয়েছে আজ। কিন্তু কোথাও কোন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় নি। সিকিউরিটির কল্যাণেই হয়তো। এরকম একটা সফল আয়োজনের জন্য সিডনি সিটি কর্তৃপক্ষ কৃতিত্ব পেতেই পারেন।

গাড়ির কাছে আসতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো। মানুষের স্রোত কাটিয়ে অলিগলি পার হয়ে আসতে সময় লাগে তো বটেই। সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে স্বপনদাকে। যে রাস্তায় সাধারণ অবস্থায় কখনোই গাড়ির হর্ণ শোনা যায়না সেখানে আজ তীব্র শব্দে গাড়ির হর্ণ বাজছে। আর মনে হচ্ছে সর্বোচ্চ গতির সীমানা কে কীভাবে ভাঙতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। লেফ্‌ট লেন ধরে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছেন স্বপনদা। পাশ দিয়ে তীব্র শব্দে হর্ণ বাজাতে বাজাতে তীব্রবেগে চলে যাচ্ছে নানারকম গাড়ি। এতক্ষণ সুশৃঙ্খল বলে যাদের প্রশংসা করেছি তারা যেন আমাকে বিদ্রুপ করছে এখন। বাড়ি এসে স্বপনদা আর নীলিমা বৌদি আবার বেরুলেন ব্ল্যাক টাউনে বাঙালির পার্টিতে যোগ দিতে। আমাকেও যাবার জন্য বলেছেন, কিন্তু কাল সকালে আমাকে ক্যানবেরা যাবার বাস ধরতে হবে সিডনি থেকে। আমি রয়ে গেলাম বাসায়। নীলিমা বৌদি এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার খাবারের ব্যবস্থা করে গেলেন। একসাথে এত কাজ করার ক্ষমতা তিনি কোথায় পেয়েছেন আমি জানিনা। টিভি খুলতেই দেখা গেলো পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে। বাংলাদেশে বসে সিডনির অনুষ্ঠান নিশ্চয় দেখেছে আমার প্রিয় মানুষেরা। তারা কি আমার কথা একবারও ভেবেছে? ঘুরে ফিরে তাদের কথাই মনে হচ্ছে এখন। হে আমার প্রিয় মানুষেরা, নতুন বছর তোমাদের জন্য সুখ বয়ে আনুক।